প্রতিবেদন

আমেরিকায় বাঙালি জীবন

কোনোভাবে আমেরিকায় ঢুকতে পারলেই হয়... হাজার হাজার তরুণ এই স্বপ্নেই এক সময় গিয়েছিল আটলান্টিকের ওপারে। বৈধ, অবৈধ নিয়ে ভাবেনি। এখন শংকিত সবাই। কি হবে? তাদের আত্মীয়রা চিন্তিত এখানে, কি হচ্ছে ওখানে... মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র থেকে

লিখেছেন **নাসিম আহমেদ**

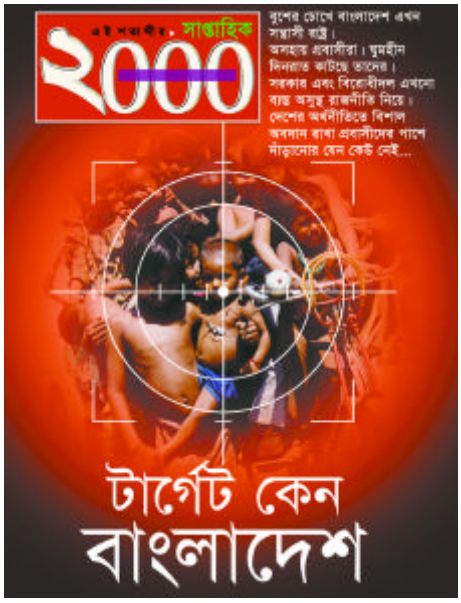

ইমরান ওয়াশিংটনে এসেছিল ১৯৯৬ সালে। ইন্টারমিডিয়েট দিয়ে কম্পিউটার সায়েন্স পড়তে এসেছিল সে, তিন বছর পর্যন্ত কোনো সমস্যা হয়নি। তারপর দু'বছর পড়াশোনা করেনি। ভিসার মেয়াদ শেষ হলেও লুকিয়ে রয়ে গেছে। এখন পয়সার বিনিময়ে কাজ করে। কোনো মতে বেঁচে আছে। পাসপোর্টের মেয়াদ প্রায় শেষ, ভিসা নেই দেশের সঙ্গে যোগাযোগ নেই। যাদের সঙ্গে কাজ করে তারাই ওর বন্ধু, কোনো আত্মীয়স্বজন নেই। কোনো মতে বেঁচে আছে ইমরান, ভালো না লাগলেও এই জীবন তাকে বেছে নিতে হয়েছে। দেশে ফিরে সে লজ্জায় পড়তে চায় না। তাই বেআইনি হলেও থেকে গেছে ইমরান।

ইমরানের মতো আরো অনেক লোক আছে আমেরিকায়। শুধু বাংলাদেশী নয় ভারতীয়, চীনা, স্প্যানিশ, মেক্সিকান, কোরিয়ান, থাই, ইন্দোনেশিয়ান, পাকিস্তানি, কুয়েতি আরোও কতো দেশী। এরা বেশির ভাগ এসেছে ১৯৮০ থেকে ১৯৯৫-এর মধ্যে। এদের অনেকে দেশ ভ্রমণে এসে আজ স্থায়ী বাসিন্দার সার্টিফিকেট (Green card) পেয়েছেন। বাকি যারা আছেন তাদের সবাই অবৈধ।

এতোদিন এই নিয়ে কেউ খুব বেশি মাথা ঘামায়নি। মোটামুটি আইন মেনে চলেছে সবাই। বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান আইআরএস, আইএনএস, এফবিআই থেকে দূরে থাকাই ছিল মূল উদ্দেশ্য। তাদের উদ্দেশ্য সফল হয়েছে। দু-একটি স্পিডিং টিকেট ছাড়া আর কখনও তেমন ঝামেলা করেনি বাংলাদেশীরা।

১১ সেপ্টেম্বরের টুইন টাওয়ারের বিভীষিকার পর থেকে অবস্থা বদলাতে শুরু করেছে আমেরিকায়। আরো পরিষ্কার করে বললে আমেরিকান সরকারের নীতিমালায়, যতদূর মনে পড়ে ঘটনার একদিন পরে সাপ্তাহিক ২০০০ অফিসে বসে আমি বলেছিলাম নন-ইমিগ্র্যান্টদের সমস্যার কথা। ঘটনা যেভাবে গড়াচ্ছে দিন দিন অবস্থা আরোও খারাপ হলে অবাক হবার কিছু থাকবে না।

আইএনএসের এই ঘোষণায় অবাক হওয়ার কিছু নেই। বাংলাদেশীদের রিপোর্ট করার সিদ্ধান্তটিকে গঠনমূলক কর্মকান্ডের মধ্যবর্তী একটি ধাপ বলা যেতে পারে। পুরো ব্যাপারটি অন্য দৃষ্টিকোণ থেকে দেখুন। আমেরিকার ভিসা

সমস্যার কথা সবার জানা। ভ্রমণকারী ছাড়া বাকিদের ভিসা পেতে হয় অনেক কষ্ট করে। ভিসা দেয়ার সংখ্যা কমিয়ে নিজেদের নজরদারিত্ব সুবিধা পাচ্ছে আইএনএস। এখন সব বাংলাদেশী ও অন্যান্য দেশের নাগরিকদের রিপোর্ট করতে বলায় লুকানোদের বর্তমান ঠিকানা, সোশ্যাল সিকউরিটি নম্বর সব কিছুর একটি ডাটাবেস তৈরি তাদের জন্য সহজ হবে। এই রিপোর্ট শেষ হলে এরপর হঠাৎ পরিদর্শনে নামার সম্ভাবনা বেশি। এমনকি বিভিন্ন বাসার মানুষ গুনে তারা বেশকিছু অবৈধ বের করে ফেলতে পারে। কারণ, এখানে বাসায় থাকতে হলে বাড়ি লিজ নিতে হয়। এই লিজ চুক্তিতে যারা ভাড়া দেয় তাদের স্বাক্ষর প্রয়োজন হয়। সেই স্বাক্ষর অনুযায়ী সোশ্যাল সিকিউরিটি নম্বর অনুসন্ধান করলে অনেকে সমস্যায় পড়বেন।

বাঙালিরা শুধু ওয়াশিংটন নয় টেক্সাস, অ্যারিজোনা ফ্লোরিডা নিউইয়র্ক সর্বত্র এখন টেনশনে আছে । যাদের গ্রিন কার্ড হয়ে গেছে তাদের চিন্তা নেই। যারা নতুন এসেছেন তারাই বেশি চিন্তিত। এখানকার ইউনিভার্সিটিগুলো আলাদা মিটিং করবে বিদেশী ছাত্রদের নিয়ে। যেহেতু স্প্রিং সেশন শুরু হচ্ছে জানুয়ারির ২৭-২৮ তারিখ। তাই মিটিংগুলো হবে ফেব্রুয়ারির প্রথম সপ্তাহে। সেখানে হয়তো ছাত্রদেরকে তাদের বর্তমান কর্মকান্ড সম্পর্কে বলা হবে।

আইএনএসের নতুন নির্দেশনামা অনুযায়ী যারা ৩০ সেপ্টেম্বরের পরে এসেছে তাদের রিপোর্ট করার প্রয়োজন নেই বলা হয়েছে। কারণ এরপর থেকে সব ছাত্রদের আঙুলের ছাপ নেয়া হয়েছে। অথচ ওয়াশিংটন, অ্যারিজোনা, শিকাগো, টেক্সাসে এমনও অনেক ছাত্র আছেন যারা ডিসেম্বরে এলেও তাদের হাতের ছাপ নেয়া হয়নি। এই নিয়ে নতুন ছাত্রদের মাঝে দ্বিধা দেখা দিয়েছে।

আমেরিকানরা যদি মনে করে যেহেতু সে পরে এসেছে তাই তার যাওয়া প্রয়োজন নেই। ফ্লোরিডার ফরিদের মতে সবারই যাওয়া উচিত।

আইএনএস যেতে হবে এই নিয়ে কারো ভয় নেই। কারণ যুক্তি ও সঙ্গত কারণ না দেখিয়ে কেউ কিছু করতে পারে না আমেরিকায়। ধরুন কোনো পুলিশ যদি কোনো অবৈধ বাংলাদেশীকে ধরে লোকটি অবৈধ বলে পুলিশ কিছু করতে পারবে না। একমাত্র আইন ভঙ্গের কারণেই পুলিশ ব্যবস্থা নিতে পারে। তাই যেসব বাংলাদেশীর ভিসা আছে তাদের আইএনএস যেতে সমস্যা নেই। কিন্তু প্রশ্ন হলো, আইএনএস গেলে কি করতে হবে। ভয়টা সেখানে। আঙুলের ছাপ দেয়া, হাজারটা প্রশ্নের উত্তর দেয়া কিংবা একই প্রশ্নের উত্তর বার বার দেয়ার মধ্যে পরোক্ষ অপমান জড়িত। আজকে যদি বাংলাদেশে আমেরিকান, ব্রিটিশ, ফ্রেঞ্চ বা জার্মানদের সঙ্গে একই ব্যবহার করা হতো তখন বোঝা যেত। অনেক আমেরিকানই মনে করেন আইএনএস বাড়াবাড়ি করছে। তারা এ কথাও বিশ্বাস করেন যে, এসব করে কোনো লাভ নেই। আইএনএসের নীতিমালায় অনেক গলদ আছে। যেমন ধরুন, নতুন নীতিমালায় মহিলাদের রিপোর্ট করতে বলা হয়নি। তাহলে প্রশ্ন ওঠে, মহিলারা কি সন্ত্রাসী হতে পারে না? রাজীব গান্ধী হত্যার ঘটনা তো অন্য ইঙ্গিত দেয়। বর্তমান দুনিয়ায় যে সব ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র শক্তিশালী অস্ত্র বের হচ্ছে তাতে পুরুষ-মহিলা কি খুব বেশি গুরুত্বপূর্ণ? বুদ্ধিমান যে কোনো মানুষই তো এগুলো চালাতে পারার কথা। এটা খুবই হাস্যকর যে, আমেরিকা যেখানে দুই লিঙ্গের সমান অধিকার নিয়ে কথা বলে, সেখানে তারাই এমন নীতি প্রণয়ন করছে। অবৈধ বাংলাদেশীদের বিরুদ্ধে আইএনএস কতটুকু কঠোর হবে তা বলা মুশকিল। কারণ এ দেশের অনেক 'অড জব' বা নগদ পয়সার কাজগুলো বাংলাদেশী, ভারতী পাকিস্তায় করে নিরাই থাকে।

এই ধরনের কাজ সাধারণত অন্যান্যরা করতে খুব আগ্রহী নয়। আমেরিকার অর্থনীতি পরোক্ষভাবে হলেও এদের ওপর নির্ভরশীল। যদি এরপর থেকে বিদেশী ছাত্ররা আরো কম আসতে থাকে তাহলে অর্থনৈতিক সমস্যা আরো বাড়তে পারে। বিশেষ করে প্রাইভেট বিশ্ববিদ্যালয়। কারণ এগুলোর বাজেট বিদেশী ছাত্রদের ওপর কিছুটা হলেও নির্ভরশীল। তা ছাড়া বর্তমানে আমেরিকার অর্থনৈতিক অবস্থা খুব ভালো নয়। বিশ্ববিদ্যালয়গুলো তাই বাজেট সমস্যায় পড়ছে। টিউশন ফি কিছুটা বাড়লেও তা যথেষ্ট হচ্ছে না। এই সমস্যার কথা চিন্তা করলে নতুন কোনো ব্যবস্থা নেয়া হতে পারে।

আইএনএস কঠোর হলে অনেক ভয়ঙ্কর হতে পারে। কিছুদিন আগে ওয়াশিংটন এয়ারপোর্টে তারা এক ছাত্রকে ফেরত পাঠিয়েছে। কাগজপত্র যথাযথ না থাকায় ছাত্রটিকে নতুন সেমিস্টার তারা শুরু করতে দেয়নি। তাই অবৈধ উপায়ে বসবাসরত অনেককেই হয়তো এবারে ফিরতে হতে পারে দেশে।

বাংলাদেশের অনেকেই অবৈধ উপায়ে থেকে গেছে কাজের আশায়। গায়ে খেটে তারা যা উপার্জন করে তাই দিয়ে চলে যায় অনেকের। অনেকের কাছে আজো তাই আমেরিকা স্বপ্নের। তবে সেই স্বপ্ন ধরা দিন দিন হয়ে পড়ছে দুরূহ। এর কারণ হিসেবে আমেরিকায় বসবাস করা বাংলাদেশীদের মধ্যে কেউ মনে করছে, হাসিনার 'তালেবান' প্রচারণা দায়ী। অনেকের ধারণা বিডিআর পুলিশের (সম্ভাব্য) তালেবান সন্দেহে পরিচালিত অভিযান দায়ী। যে অভিযানের পরে টাইম ম্যাগাজিনে 'গল্প' ছাপানো হয়েছিল। আর কিছু লোকের ধারণা, কিছুদিন আগে ভারতের বাংলাদেশকে তালেবান হিসেবে চিহ্নিত করাই মূল কারণ। আরো বিজ্ঞদের ধারণা গ্যাস রপ্তানীর বিষয়ে সরকারের সঙ্গে বনিবনা না হওয়াতেই এমন সিদ্ধান্ত। তবে এমন তো হতে পারে চারটি ঘটনাই 'আইএনএস'কে উস্কে দিয়েছে। হতে পারে না?